হেমায়েত বাহিনী

হেমায়েত উদ্দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চের মাঝামাঝি থেকে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বিভিন্ন বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছোট দল গঠন করেন। তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতের পর ২৯শে মার্চ তারিখে ঢাকার জয়দেবপুর সেনানিবাসে অবস্থানরত পাঞ্জাবি সৈন্যদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্য এবং কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের অন্যতম ব্যান্ডপার্টির হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন কয়েকজন সৈন্যকে নিয়ে ফরিদপুরে আসেন। এ সময় ফরিদপুরের স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় তিনি পাকিস্তান সৈন্যদের প্রতিহত করলে বেশ কিছুদিন ফরিদপুর পাক সৈন্য মুক্ত থাকে। কিন্তু ঢাকা থেকে আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রসহ পাকিস্তান সৈন্য ফরিদপুর গেলে হেমায়েত উদ্দিন সঙ্গীদের নিয়ে ২৮ শে এপ্রিল নিজ গ্রাম কোটালিপাড়ার টুপুরিয়ায় সরে আসেন। এ সময় স্থানীয় রাজাকারেরা তাকে আত্মসমর্পন না করলে তার ছেলে এবং স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুকমী প্রদান করে। হুমকীর খবর শুনে হেমায়েতের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন।[৩] হেমায়েত সেখান থেকে সরে গিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি এবং তার সঙ্গীরা কোটালিপাড়া থানা আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র নিজেদের দখলে নেয়।

হেমায়েত বাহিনী

কিছুদিনের মধ্যেই হেমায়েতের মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি একটি বিরাট বাহিনীতে রূপ নেয়। এ বাহিনীতে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৫,৫৫৮ জন।[৩] এ বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র বরিশালের উত্তরাঞ্চল, খুলনা-বাগেরহাট ও যশোরের কালিয়া সহ গোপালগঞ্জ এবং মাদারীপুরের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হেমায়েত বাহিনী পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ বাহিনী ৪২টি দলে বিভক্ত ছিল।[৩] প্রতিটি দলে কমান্ডার, সহকারী কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় ভাবে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালিত হত। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে কোটালিপাড়ার জহরেরকান্দি হাই স্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। হেমায়েত বাহিনীর মধ্যে বিচার বিভাগও ছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে ২ জন গ্রুপ কমান্ডার সহ মোট ৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল।[৩]

তাঁর নেতৃত্বে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে হেমায়েত বাহিনী গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় প্রায় ৫০০ পাকিস্তানি সেনাকে পরাস্ত করে এই এলাকা শত্রুমুক্ত করে। ২ ডিসেম্বর রাতে ২৪ জন সাব কমান্ডার নিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন চূড়ান্ত আক্রমণের।

মৃত্যু

২২শে অক্টোবর শনিবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রন্ত হয়ে তিনি ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। কোটালীপাড়ার টুপুরিয়া নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হেমায়েত বাহিনী জাদুঘর প্রঙ্গণে ২৪শে অক্টোবর তাকে সমাহিত করা হয়।[৪]

হেমায়েত উদ্দিন থেকে হেমায়েত বাহিনীর জন্ম। দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন সর্ব প্রথম তার ১৭ জন সংঙ্গী (সৈনিক) নিয়ে ২৮ মার্চ ভোর ৫ঃ০০ ঘটিকায় জয়দেবপুর ক্যান্টোনমেন্ট আক্রমন করে দখল করে নেয়। উক্ত ক্যান্টোনমেন্ট ভেঙ্গে শতাধিক অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর এলাকায় এসে মুক্তিযুদ্ধ করার উদ্দেশ্য পদ দলে সংগীয় যোদ্ধাদেরকে নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা শুরু করেন। পথে ৪ জন তার সংঙ্গী শাহদাত বরণ করেন। প্রথম পর্যায়ে পথে পথে প্রায় ৩৫/৪০ টি যুদ্ধ ও আক্রমন করে তারা পথ আগায়।

২১ এপ্রিল ফরিদপুর পুলিশ লাইন দখল করে নেয় হেমায়েত উদ্দিন সহ তার সংগী যোদ্ধারা। পুলিশ লাইন থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র গোলা-বারুদ ফরিদপুর এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী যুবকদের মধ্যে বিতরন করা হয়। এতে করে ফরিদপুর এলকায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়। ২৮ এপ্রিল হেমায়েত উদ্দিন তার দল বল নিয়ে কোটালীপাড়া নিজ গ্রামে পৌছায়।

৩০ শে এপ্রিল পাক সেনাদের হাতে বন্দী থাকা কোটালীপাড়ার ৩৬ জন আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে ডাক বাংলা থেকে তালা ভেংঙ্গে মুক্ত করেন। এ কারণে ৩রা এপ্রিল হেমায়েত উদ্দিনের বাড়ী-ঘর স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি পাক বাহিনী এসে জ্বালিয়ে দেয়। হেমায়েত উদ্দিন গোটা পরিবার ও সংগীদের নিয়ে পিঠা বাড়ী নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। ৫ই, মে, সংগে থাকা সৈনিক ইব্রাহীম ও সোলেমানকে সংগে নিয়ে নাটকিয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কোন প্রকার গোলা-গুলি ছাড়াই কোটালীপাড়া থানা দখল করে নিয়ে কলাবাড়ী বাবু চিত্ত গাইনের বাড়ীতে বসে কোটালীপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টি করেন। ৭ই, মে, পাক আর্মি কোটালীপাড়া থানা পূনরায় দখল করে।

৯ই, মে, দ্বিতীয়বার আক্রমন করে কোটালীপাড়া থানা হেমায়েত বাহিনী দখল করে সরকারী সমস্ত স্থাপন জনবল দিয়ে ভেংঙ্গে-চুড়ে গুড়িয়ে দিয়ে বাবু লক্ষী কান্ত বলের বাড়ীতে প্রথম ঘাটি স্থাপন করেন। এখানে যুক্ত হয় ডোনার কান্দির পাক আর্মি মারা ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা। ১৫ই, মে, এম.সি.এ এ্যাডভোকেট আসমত আলী খান, মাদারীপুর ও এম.সি.এ হরনাথ বাইন, উজিরপুর এবং স্থানিয় আওয়ামী লীগ ও কমিনিষ্ট পার্টির নেতাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থে হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিনকে মেজর হেমায়েত উদ্দিন নামে ঘোষণা দিয়ে হেমায়েত বাহিনী নামকরন করা হয়। এখানেই যুবকদের একটি ট্রেনিং সেন্টার জহরের কান্দি হাই স্কুল মাঠে এবং একটি মহিলা ট্রেনিং সেন্টার নারিকেল বাড়ী মিশনে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সেনা আদলে হেমায়েত বাহিনীর যোদ্ধাদেরকে কোম্পানী প্লাটন ও সেকশন আকারে নিয়মিত বাহিনীর পরিচালনা শুরু হয়।

১৪ই, জুন, হরিনা হাটির যুদ্ধে মেজর হেমায়েত উদ্দিনের বডিগার্ড ইব্রাহীম শাহাদত বরণ করেন এবং ৩০ জন পাক আর্মি ও রাজাকার হেমায়েত বাহিনীর হাতে ধৃত হয়। পরের দিন হেমায়েত বাহিনীর বিচার বিভাগের মাধ্যমে তাদের ফায়ারিং স্কটে দিয়ে মৃত্যু দন্ডের পর কোটালীপাড়া রাজপুর গ্রামে তাদেরকে কবর দেয়া হয়। ২২শে, জুন, কোটালীপাড়া আক্রমন করে হেমায়েত বাহিনী সব কিছু দখল করে নেয় এবং ফুড গোডাউন দখল করে ৮,০০০ (আট হাজার) মন গম, চাউল পেয়ে হেমায়েত বাহিনীর খাদ্য ভান্ডার সয়ং সম্পূর্ন হয়। ১৪ই, জুলাই, রাম শীলের যুদ্ধে হাবিলদার মকবুল শহীদ হন এবং মেজর হেমায়েত উদ্দিন সহ ৬ জন যোদ্ধা মারাত্মক ভাবে আহত হন। ১৪ই, জুলাই, যুদ্ধের পর চারদিকে যুদ্ধ বেগবান হয়। তখন হেমায়েত বাহিনীকে ৪২টি কোম্পানিতে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। ৪২ জন কোম্পানী প্রধানকে কেপ্টেন হিসাবে প্রোমশন দেন হেমায়েত বাহিনী প্রধান। আগষ্ট মাসে মধূমতি নদী হইতে পাকবাহিনীর গান বোর্ড দখল করে কোটালীপাড়ার কলাবাড়ীতে নিয়ে রাখা হয়। মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হয়, শিকির বাজার, টিহাটি, মেয়ার হাট খোলা, চৌধুরীর বাজার, ডুমরিয়া, চৌমুহনী, কুরপালা তারাশি, রাজাপুর, বরিশালের গৈলা, সাতলা, ধামুরা বাজার, বাটাজোর, সাউদের ব্রীজ ইত্যাদি স্থানে। হেমায়েত বাহিনী মোট ১০৪টি ছোট বড় যুদ্ধ ও অপারেশন করে। বিভিন্ন যুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর ২৪ জন বীর যোদ্ধা আহত হয় এবং ১৮ জন বীর যোদ্ধা শাহাদত বরণ করেন। ১৯৭১ এর ৩রা, ডিসেম্বর, হেমায়েত বাহিনী পাক বাহিনীর উপর উপর্যুপুরি আক্রমন করে কোটালীপাড়া, টুংগীপাড়া, ভাটিয়া পাড়া, গৌরনদী, কালকিনী, রাজৈর সহ পূর্ব গোপালগঞ্জ মুক্ত করে। ডিসেম্বরের ৫ তারিখ দিবা-গত রাতে হেমায়েত বাহিনী সারাসী আক্রমনের খবর পেয়ে পাকবাহিনী গোপালগঞ্জ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৭ ডিসেম্বর হেমায়েত বাহিনীর কয়েকটি কোম্পানী ভাটিয়াপাড়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং একটি কোম্পানী ফরিদপুর ও রাজবাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। বাকী কোম্পানি গুলি পূর্ব গৌরনদি ও মাদারী পুরের দিকে অগ্রসর হয়। মাঝবাড়ী হাই স্কুলে শেষ হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে দালাল রাজাকার ও যুদ্ধ অপরাধীদের ধরে এনে আটক রাখা হয়। হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতায় খুশি হয়ে ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ. জলিল হেমায়েত উদ্দিনকে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসাবে ঘোষনা দেন। জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১০ই, জানুয়ারী, ১৯৭২ ইং বাংলাদেশে প্রত্যবর্তন করার পর গোপালগঞ্জের মহাকুম প্রশাসকের মাধ্যমে হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্র সমার্পণের আহ্বান পেয়ে হেমায়েত বাহিনীর যোদ্ধারা ঢাকায় যাত্র করেন এবং ২৪শে, জানুয়ারী, ১৯৭১ ইং সালে ধানমন্ডিতে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধুর পদতলে হেমায়েত বাহিনীর সকল যোদ্ধা অস্ত্র সমার্পণ করেন।

হেমায়েত বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম